তিতির

—জুলফিকার!

—সুখলাল!

একসঙ্গেই ডেকে উঠল দুজন। তারপর কয়েক সেকেন্ড এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কেবল। বাতাসে ছড়িয়ে যেতে লাগল লেবু-ঘাসের গন্ধ—মাথার ওপর উড়তে লাগল একটা শঙ্খচিল।

দুই দেশের সীমান্তরেখা। দুই রাষ্ট্রের প্রতিহারী।

মাঝখানে ঘন লেবুঘাস, টুকরো টুকরো ঘাস-জমি আর কিছু আগাছার জঙ্গল ছড়ানো পঞ্চাশ গজের মতো নো-ম্যানস-ল্যান্ড। অবশ্য স্বাভাবিক সময়ে। খবরের কাগজে কিছু উত্তেজনার তাপ লাগলে, নেতারা কখনো কখনো গরম বক্তৃতা দিলে, দূরত্বটা তিন-চারশো গজ দাঁড়িয়ে যায়। তখন মুখের রেখা কুটিল হয়ে ওঠে—বন্য আলোয় জ্বলতে থাকে চোখ, হাতের রাইফেল উদ্যত হয়ে ওঠে। সার্জেন্ট মেজরের আসা-যাওয়া বেড়ে যায়। আর আবহাওয়া শান্ত থাকলে অনেকটা কাছাকাছি এগিয়ে আসা, আড়চোখে লক্ষ্য করা পরস্পরকে—একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে এক-আধটু আলাপ করার ইচ্ছে

—আরে ভাইয়া!

—আরে ভাইয়া!

আরো কয়েক সেকেন্ড। এ ওর দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকা। লেবু-ঘাসের মিঠে গন্ধভরা হাওয়ায়, বিকেলের লালচে আলোতে অপ্রতিভভাবে ভাবতে চেষ্টা করা—কী বলা যায় এর পর। সুখলালের চোখে পড়ল, জুলফিকারের গোঁফে যেন পাক ধরেছে। আর জুলফিকারের মনে হলো, এর মধ্যে যেন অনেকটাই বুড়িয়ে গেছে সুখলাল।

বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের বুড়ো আঙুল এতক্ষণ বাঁধা নিয়মে কাজ করছিল জুলফিকারের। যে কোনো একটা কথা আরম্ভ করার জন্যেই জুলফিকার জিজ্ঞেস করলেন, খইনি খাইবো?

—কাহে নেহি?—সুখলাল স্বচ্ছন্দ হয়ে হাসল।

নো-ম্যানস-ল্যান্ডের আগাছা মাড়িয়ে দলিত লেবুঘাস থেকে আরো খানিক উগ্র

গন্ধ ছড়িয়ে দুজনে দুদিক থেকে এগিয়ে এল। তারপর একেবারে সামনাসামনি। আধ হাতের ভেতর।

সুখলাল হাত বাড়াল, খানিকটা খইনি ঢেলে দিলে জুলফিকার। একসঙ্গেই মুখ পুরল। আবার খানিকটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা। লেবুঘাসের ওপর দিয়ে শির শির করতে লাগল বাতাস, একটু দূরে একজোড়া তিতির এ ওকে ডাকতে লাগল।

জুলফিকার বললে—বসবে একটুখানি?

—কুজ হরজা নেই—আবার হাসল সুখলাল।

একটুখানি পরিষ্কার ঘাসের জমির ওপর বসে পড়ল দুজন। বাঁদিকে আন্দাজ আধমাইল দূরে একটা সাদা একতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। দুজোড়া চোখ অন্যমনস্কভাবে সেই বাড়িটার ওপর পড়ে রইল কিছুক্ষণ।

—শেঠজীকা গদ্দী!—সুখলাল আস্তে আস্তে বললে।

—হ্যাঁ।—জুলফিকার দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ করে থুতু ফেলল ঘাসের ওপর। বলল—খুব আরামসে থাকে।

এক হাতে গোঁফের একটা প্রান্ত নিয়ে পাকাতে লাগলো : হ্যাঁ, ওরা আরামসে থাকে।

—বে আইনি কারবার চালায় হরবখৎ।

—ওদের বদন ছোঁবে কে?—তিক্তভাবে জুলফিকার হাসল : হিন্দোস্থান হো—পাকিস্তান হো—ওদেরই তো মওকা। যত হয়রানি সব গরিবের বেলায়।

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সমর্থন করল সুখলাল।

—গরিবের ওয়াস্তে দুসরা কানুন। আধা সের সুপারি ইয়া সেরভর কড়ুয়া তেল নিয়ে বর্ডার পার হতে গেলে গোলী খেয়ে মরবে।

—আরে গোলী মারব আমরাই।—চাপা বিস্বাদ গলা জুলফিকারের।

—নোকরি।

—হ্যাঁ, নোকরি।

স্নিগ্ধ, শান্ত বিকেল। শরতের লাল রোদের ঝিলিমিলি। লেবুঘাসের গন্ধ। তিতিরেরা এ ওকে ডাকছে : শেখ ফরিদ কুদরৎ—শেখ ফরিদ কুদরৎ—

ছেলেবেলার অভ্যাসের প্রতিধ্বনি করল সুখলাল :

'দেখ ফরিদ কুদরৎ
তেল-নিমক আদরৎ—

দুজনেই হেসে উঠল একসঙ্গে। জুলফিকার বললে—আমাদের গাঁওয়ে নদীর ধারে অনেক তিতির থাকতো।

—হ্যাঁ, বহুৎ।

—আর জিমিন্দার কামতাপরসাদজী বন্দুক নিয়ে তিতির মেরে আনত।

—এখন আর তিতির মারে না। অ্যাসেমব্লিতে ঢুকেছে।

—এখন আদমি মারে—জুলফিকার মন্তব্য করল মৃদু হাসিতে।

—পাক্কা!—সুখলাল মাথা নাড়ল।

কিন্তু কামতাপরসাদকে ছাড়িয়ে দুজনের মন অনেক পেছনে চলে গেছে। ওদের গ্রাম। রেলের টিশন ছড়িয়ে পুরো চার ক্রোশ। গাঁয়ে ঢোকার মুখে সেই কতকাল আগেকার নবাবী তালাও। তার একপাশে বিরাট মহল চকনাচুর হয়ে ভেঙে পড়ে আছে—রাত করে লোকে সেদিক দিয়ে হাঁটতে সাহস পেত না—জিনের ভয়। মজে-আসা নবাবী তালাওয়ের ভাঙা ঘাটে নাকি কত লোকে দেখেছে—জ্যোৎস্নারাতে সাদা কাপড়পরা দুটো 'চুড়ৈল' সেখানে গলা জড়াজড়ি করে বসে আছে।

ওদের ছেলেবেলায় এই জুলফিকার এই সুখলাল—আরো কতজন ডানপিঠে রাত করে জিন-চুড়ৈল দেখতে এসেছে। কিন্তু কোনোদিন দেখা পায়নি তাদের। একবার কেবল লক্কড়ের ডাক শুনে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল সবাই।

গাঁয়ে ঢুকতে মহাবীরজীর ধ্বজা। আরো এগিয়ে মসজিদ। কামতাপরসাদজীর মস্ত বাড়ি। মানুষের ঘরদুয়োর। বাজার। আরো একটু এগোলে পুরনো পীরের দরগা। একটুখানি মাঠ। তারপর গাঁয়ের নদী। শিবমন্দির। নদীর নাম ঝুমঝুমিয়া।

ঘাসের বনে তিতির ডাকে। বালি ডাঙায় চিকচিক করে ভাঙা ঝিনুকের টুকরো। বালির ওপর পায়ের দাগ এঁকে এঁকে চাহার দল ঘুরে বেড়ায়, তিরতিরে নীল জলের ধারে এক ঠ্যাং তুলে দাঁড়িয়ে থাকে বগুলা।

এমনিতে হাঁটুভোর জল। মানুষ-গরু-ভৈঁসা হেঁটে পার হয়। তারপর এক সময়—আকাশের কালো মেঘেরা দলবেঁধে দেখা দেবার আগেই হড়পা বান নামল দূরের পাহাড়ে শাল-পলাশের বনে। আরেঃ বাপ—ক্যা বাতাউ? কয়েক ঘড়ির মধ্যেই নদীর বদন বিলকুল পালটে গেল। লাল জল নেমে এল হুড়হুড় করে—কী তার তোড়, মানুষ দূরে থাক—তার ভেতর হাঁথি ভি পড়লে কুটো হয়ে উড়ে যায়। ফেনা ছুটে যাচ্ছে তীরের মতো, পাক খেয়ে খেয়ে যাচ্ছে গাছের ডাল, জলের তলায় গড়ানো পাথর গুঁড়ো হচ্ছে মড়মড়িয়ে। আর একবার কান পেতে শোনো জলের ডাক—কে বলবে এ সেই কুলকুল করে বয়ে চলা ছোট ঝুমঝুমিয়া? মনে হবে, লাখো ভৈঁসা যেন পাগল হয়ে গজাতে গজাতে ছুটে চলেছে।

এই নদীর সঙ্গে যেন ওদের জীবনের যোগ ছিল, ওই ঝুমঝুমিয়া নদীর সঙ্গে। ঝিনুক কুড়িয়েছে, বালি নিয়ে গেছে, শীতের দিনে নদী পার হয়ে কোঁচর ভরে নিয়ে এসেছে 'বয়ের'। তিতিরের ডাক শুনে সাড়া দিয়ে বলেছে : তেল-নিমক-আদরৎ, তেল-নিকম-আদরৎ। কামতাপরাসদের ক্ষেত থেকে চুরি করে এনেছে কাঁচা ছোলা আর কচি বেগুন—নদীর ধারে বসে পুড়িয়ে খেয়েছে—জুলফিকার, সুখলাল, আরো অনেকে।

আবার নদীর মতোই গাঁয়ের জীবনেও বান নেমেছে। হোলি-মহরম-ঈদ-

মুবারক-দেওয়ালী। দুঃখের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে 'হায়জা'—শীতের মাঠে যখন সর্ষে ক্ষেতে দেওয়ালী জ্বলেছে, তখন কোথা থেকে এসেছে প্লেগ। গাঁও ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে মানুষ আর বড়কা সুই নিয়ে তেড়ে এসেছে ডাক্তারেরা।

তবু বানের জল যেমন চলে যায়—তেমনি করে সব মিলিয়ে গেছে একদিন। আবার নদীর ধারে ঘাসবনের ভেতর তিতিরের ডাক। সকালে সন্ধ্যায় শুনিয়েছে শেখ ফরিদের মহিমা। বালি নিয়ে যাওয়া, ঝিনুক কুড়োনো। ঝাঁক বেঁধে চাহার-নাচানাচি। আসমানের চাঁদ-তারার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেওয়ালী জ্বালানো হাউই ছোঁড়া। কাওয়ালী গানের সুরে, আতরের গন্ধে আর পোলাও-কোর্মার খোশবুতে ঈদের সন্ধ্যা আনচান।

তারপর আর এক বান এলো। ঝুমঝুমিয়ে থেকে নয়—এল কলকাতা থেকে, এল লাহোর থেকে। দেখতে দেখতে মানুষ 'জানবর' হলো। গরুর মাথা পড়ল শিবমন্দিরে, ভাঙল মসজিদ, আগুন জ্বলল বাজারে, ঝুমঝুমিয়ার তিরতিরে নদীর জল দিয়ে ভেসে চলল লাশের পর লাশ। বগুলারা উড়ে পালাল, ঘাসবনের মধ্যে আর তিতির ডাকল না—শেখ ফরিদের দোয়া চাইবার মতো জোর পেল না গলায়। তখন কোথায় জুলফিকার—কোথায় সুখলাল!

স্মৃতির ভেতরেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল দুজনেই। চিন্তার এইখানটাতে এসে দুজনেরই চোখ জ্বলে উঠল এক সঙ্গে। বিকেলের আলোয় জুলফিকার দেখল সুখলালের মুখের ওপর মেঘ নেমেছে, সুখলাল দেখল গোঁফের একটা দিক হিংস্রভাবে চিবোচ্ছে জুলফিকার।

কিন্তু সে আজ কতকালের কথা। অনেক পানি, বহুৎ ধূপ, অনেক জাড়া পার হয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে। ভুলো ভাই-উ বাত ছোড় দো। উ বীত গয়া। সময় এমনিভাবেই চলে। 'আঁজুলিকা পানি।'

সুখলাল হাসল—জুলফিকার হাসল। আজ আর কারো ওপর কারো রাগ হচ্ছে না। কী করতে পারি তুমি আমি। নবীশ।

বাতাসে লেবুঘাসের গন্ধ। নিঃশ্বাস টানতে টানতে স্নেহ-শীতলতায় জুড়িয়ে যায় কলিজা। বিকেলে লাল আলোকে দেওয়ালীর আলোর মতো মনে হয়। এখন আর কোনো বিরোধ নেই কোথাও।

—দেখে যাও না?—জুলফিকার জানতে চাইল।

—নাঃ।—সুখলালের ছোট্ট জবাব।

—তোমার ক্ষেত ছিল, হাল ছিল—কোথায় সেসব?

ক্ষত শুকিয়ে গেলেও এখনো রক্ত ফুটে উঠতে চায়। সুখলালের চোখে কুয়াশার মতো আবারণ নামল একটা।

—ভাইটা তো খুন হলো দাঙ্গার সময়। আমি চলে এলাম কলকাতায়। গোলমাল থামলে দেশে এসে জানলাম, আর জমি আর নেই। আমি আর ভাই নাকি

টিপসহি দিয়ে টাকা নিয়েছিলেন কামতাপরসাদের কাছ থেকে। জমি কামতাপরসাদের খাস হয়ে গেছে।

জুলফিকার নড়ে উঠল।

—নিয়েছিল টাকা?

—না—কভি নেহি।

—হারামী! দাঁতে দাঁত চাপল জুলফিকার।

—এখন অ্যাসেম্বলীর মেম্বার।

—হ্যাঁ, ওদেরই মওকা।—জুলফিকার গোঁফের একটা প্রান্ত চিবোতে লাগল! রজ্জব আলীভি করাচীতে গিয়ে খাসা আছে। খাসা মোকাম, বড়া নোকরি।

সুখলাল বললেন—দুসরা হারামী। তোমার বোনকে—

আর বলতে পারল না। জিভ জড়িয়ে এল সংকোচে।

জুলফিকার চোখ তুলল আকাশে। সূর্য আরো পশ্চিমমুখো। রোদের রং আরো ঘন হয়ে এসেছে। যেন কে আঁজলা রক্ত ঝরে পড়ল জুলফিকারের মুখে।

—গলায় ফাঁস দিয়ে মরল বোনটা। থানার দারোগা সব গড়বড় করে দিল। কিচ্ছু হলো না রজ্জব আলীর।

—ওদের কিছু হয় না।

—না।

—সব এক দলের।

—বিলকুল।

আবার চুপচাপ। বাতাসে ঘাসের গন্ধ। সন্ধ্যার আভাস পেয়ে দু-চারটে পোকা ডাকতে আরম্ভ করেছে। তিতিরের সাড়া নেই। কান পেতে ওদের কথাই শুনছে কিনা কে জানে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুখলাল।

—আর কামতারপরসাদজাই আমাদের ক্ষেপিয়ে দিলেন।

—রজ্জব আলী আমাদের বলল, শহীদ হতে।

—আমার ভাই মরল, মামা মরল।

—আমার ঘর-দরোজা ভি নিকাশ হয়ে গেল।

—ওরা আরামসে আছে।

—ওরাই থাকবে।

—আমার ঘর নিল!

—আমার ইজ্জত নিল!

—ওদের জন্যে দুসরা কানুন।

—হ্যাঁ, ওদের কানুন আলাদা।

এ ও মুখের দিকে তাকাল। ক্লান্তি, তিক্ততা, নিরাশা। জুলফিকারের গোঁফে

পাক ধরেছে, মুখের রেখাগুলো কেমন ভেঙেচুরে একাকার হয়ে আছে। ঝুমঝুমিয়া নদীর এতটুকু চিহ্নও কোথাও নেই। আছে লাহোরের পোড়া ছাইয়ের গুঁড়ো, কলকাতার শুকনো রক্তের দাগ।

বিকেলের আকাশে কলধ্বনি তুলে উড়ে গেল হাঁসের দল। মাথা তুলে দেখল দুজনেই। চিনল—'লাল সর'। দিগন্তের ঘন গভীর রৌদ্রে কালচে লাল পাখিগুলো যেন চাপ বাঁধা রক্ত মেখেছে গায়ে।

সুখলাল বললে, এমনি করে হাঁস উড়ে যেত আমাদের গাঁয়ের ওপর দিয়ে। ঝুমজুমিয়া পার হয়ে যেত বড় বিলায়।

—রাজহাঁস এসে নামতো ধানের ক্ষেতে। চাঁদনী রাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত নতুন ধানের শিষ।

—আর কখনো কখনো ক্যাঁককেঁটিয়া এসে পড়ত নবাবী তালাওয়ে।

—ভোরের আগে রজব আলী যেত শিকার করতে, কামতাপরসাদও যেত।

আবার কামতাপরসাদ—আবার রজ্জব আলী। স্মৃতির ভেতরে ঘিরে গিয়ে, সোনালী দিনগুলোর মধ্যে ডুব দেবারও উপায় নেই। দুদিক থেকে দুটো 'মগরের' মতো ছুটে আসে ওরা। সামনে এসে দাঁড়ায় নবাবী তালাওয়ের শ্যাওলাভরা কালো জলের থেকে উঠে আসা সেই দুটো 'চুড়ৈল'-এর মতো।

—ও বাত ছোড় দো।—একটা ঘাসের শিষ ছিঁড়ে নিলে সুখলাল।

—ছোড় দো।

—যেতে দাও ও-সব। কী হবে আর ওকথা ভেবে? তোমার ভিটেমাটি মুছে গেছে চিরদিনের মতো, আমার জমি-জিরাত খাস হয়ে গেছে কামতাপরসাদের। তুমি এখন পরদেশী—আমার দেশ থেকেও নেই।

—এখন ডেরা-ডাণ্ডা বেঁধেছ এই বঙ্গালেই? সুখলাল জানতে চাইল।

—ক্যা করে? থাকতে তো হবে কোথাও।

—কেমন লাগে?

জুলফিকার বিস্বাদ হাসি হাসল।

ভিজে মাটি। প্যাঁচপেঁচে জল। বোখার হয়।

—হ্যাঁ?

—ভালো আটা মেলে না। পেটের গোলমাল হয়।

হ্যাঁ?

সুখলালের চোখে পড়ল এতক্ষণে। শুধু গোঁফই পাকেনি জুলফিকারের, চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, কালির প্রলেপ পড়েছে চোখের কোণায়।

—তবু তো এই তোমার আপনা ঘর এখন।

—হ্যাঁ, আপনা ঘর। দাঁতের ফাঁক দিয়ে আবার পিচ করে থুতু ফেলল জুলফিকার। তারপর চিবোতে লাগল গোঁফের ডগা।

বিকেলের লাল কালো হচ্ছে ধীরে ধীরে। ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে লেবুঘাসের বনে। পোকার ডাক চড়া পর্দায় উঠছে ক্রমশ। আবার তিতিরের ডাকাডাকি শুরু হয়েছে। শেখ ফরিদ কুদরৎ—শেখ ফরিদ কুদরৎ—

—অভি যান না।—জুলফিকার উঠে দাঁড়াল।

—ম্যয় ভি চলে।—উঠে দাঁড়াতে হলো সুখলালকেও।

—নোকরি।

—নোকরি।

দুই প্রহরী। দুই সীমান্তের রক্ষী। মাঝখানের নো-ম্যানস-ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে। দুজনের ভেতরে দু হাতের ব্যবধান।

নিজেদের জায়গায় ফিরে যাওয়ার আগে আর একবার এ ওর দিকে তাকাল। দু-জোড়া দৃষ্টিই কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে। আঁসু?—না আঁসু অনেক আগেই শুকিয়ে গেছে।

—আমরা বেকুব।—ফিসফিস করে বললে জুলফিকার।

—বুদ্ধি।—তেমনি গলায় জবাব দিলে সুখলাল।

আর ঠিক তক্ষুনি হাঁ হাঁ করে উঠল জুলফিকার। চেঁচিয়ে বললে, হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার—

ঘাসের মধ্য থেকে যে গোখরোটা ফণা তুলছিল, তার ছোবলটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ল মাটিতে। তার আগেই লাফিয়ে দুহাত সরে গেছে সুখলাল। আর ছোবল বসিয়ে মাথাটা তুলে নেবার আগেই জুলফিকারের রাইফেলের কুদো এসে পড়েছে সাপটার ফণায়। থেঁতলে একাকার হয়ে গেছে সেটা।

দুই সীমান্তের মাঝখানে নো-ম্যানস্-ল্যান্ড। গোখরো সাপেরা বাসা বেঁধেছে সেখানে।

অন্তিম যন্ত্রণায় মোচড় খেতে লাগলো সাপটা। পিছল চিত্র করা শরীরটা এঁকেবেঁকে চলল নানা ভঙ্গিতে।

—ইবলিশ!

—হারামী।

—অনেক সাপ আছে এখানে।

—বহুৎ!

—তাই দুই সীমানার ফারাক।

সুখলাল তাকাল জুলফিকারের দিকে। জুলফিকার তাকাল সুখলালের দিকে। একটাই প্রশ্ন—একটাই, ঝুমঝুমিয়ায় আবার কি বান ডাকবে কখনো? কোনো নতুন বান?

—চলে।

—চলে।

প্রতিহারীরা ফিরে চলল। জুলফিকারের পা চলল জোরে। একটা জীপ গাড়ির আওয়াজ আসছে যেন দূর থেকে। সার্জেন্ট মেজর রাউন্ডে বেরিয়েছে হয়তো।

নো-ম্যানস-ল্যান্ডে। গোখরোর ফোকরে ভরা মাটির ওপর অন্ধকার নামল। মাথা থাঁতলানো সাপটার স্থির হয়ে এলো আস্তে আস্তে। বাতাসে ছড়াতে লাগল লেবুঘাসের করুণ গন্ধ। পোকাদের ঐক্যতান উঠতে লাগল একটা প্রকাণ্ড করাত চলবার কর্কশ আওয়াজের মতো।

আর—আর তিতির ডাকতে লাগল।